বিজ্ঞান কি উপাসনা-ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী?

প্রদীপ দেব

১

রিলিজিয়ন (religion) আর *প্রোপার্টি (property)* উভয় অর্থেই আমরা *ধর্ম* শব্দটি ব্যবহার করি। বাংলা ভাষার এ সীমাবদ্ধতা কাটানোর জন্য *রিলিজিয়ন* শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে *উপাসনা-ধর্ম* ব্যবহার করা হচ্ছে।

২

প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়া আরো লক্ষাধিক প্রজাতির প্রাণী আছে। কিন্তু শুধুমাত্র মানুষই উপাসনা-ধর্ম পালন করে। কারণ মানুষ তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে উপাসনা-ধর্মের সৃষ্টি করেছে এবং তার সুফল কাজে লাগানোর জন্য নানারকম ফন্দি-ফিকির চালিয়ে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, সে কাজে মানুষ অনেকটাই সফল হয়েছে। মানুষ নিজেদের মতো করে সৃষ্টিকর্তার ধারণা তৈরি করে নিয়েছে বলেই মানুষের তৈরি সৃষ্টিকর্তার বেশির ভাগ আচরণই মানুষের মতো। তার রাগ আছে, অনুরাগ আছে, ঘৃণা আছে, লোভ আছে এবং সীমাবদ্ধতাও আছে। মানুষের তৈরি একেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর - আরেকটি ঈশ্বর তৈরি করতে পারেন না। পশুপাখিদের মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা থাকলে - তাদের ঈশ্বর তাদের মতোই হতো। মানে ছাগলের ঈশ্বর হতো ছাগলের মতো, গরুর ঈশ্বর গরুর মতোই ঘাস খেতো।

মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবে বলেই নিজেদের ঈশ্বরকে অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড় বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। এজন্য তারা নানারকম ধর্মগ্রন্থে নানারকম কাল্পনিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে - যেখানে দেখানো হয়েছে - জীব ও জড়বস্তু নির্বিশেষে ঈশ্বরের ধারণা মেনে চলছে। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্যকোন প্রাণীর ভেতরে যে ঈশ্বর বিশ্বাস কাজ করে - তা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই।

কিছু কিছু মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। মানুষের জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাস একটি প্রধান সংস্কার। এই সংস্কার ভালো কি মন্দ - সেটা ব্যক্তিনির্ভর। একেক জনের ক্ষেত্রে একেক ভাবে কাজ করে এই বিশ্বাস। সে কারণেই ঈশ্বর-বিশ্বাস অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের সাথে একে মেলানোর চেষ্টা করার কোন মানে হয় না। কারণ বিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেনা - নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক কার্যকারণের ওপর।

৩

বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে উপাসনা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কমতে শুরু করেছে। উপাসনা ধর্মকে পুঁজি করে আখের গোছানো এখন আর আগের মত সহজ নেই। একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এখন উপাসনা-ধর্মের অলৌকিক আষাঢ়ে গল্পে বিশ্বাস করে না। উপাসনা-ধর্মকে এখন বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে দেখা যাচ্ছে প্রায় সময়েই। উপাসনা-ধর্মে বিজ্ঞান আছে এটা প্রমাণ করতে পারলেই যেন প্রমাণ করা হয়ে যায় যে ধর্মই সকল বিজ্ঞানের উৎস।

ধর্মীয় মোল্লাদের অযৌক্তিক উপাসনা ধর্মব্যাখ্যায় সাময়িক একটি উন্মাদনা সৃষ্টি করা গেলেও মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভীত শক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বিজ্ঞান জানা কেউ - বিজ্ঞানের অধ্যাপক বা বৈজ্ঞানিক গবেষক যদি উপাসনা ধর্মের পক্ষে বলেন - মনে করা হচ্ছে তাতে খুব কাজ হয়। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মোটা অংকের পারিতোষিক দিয়ে বিজ্ঞান-জানা লোক ভাড়া করছে উপাসনাধর্ম প্রচারের কাজে।

এক্ষেত্রে বাইবেল সমর্থনকারীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তারা নতুন নতুন কৌশলে বাইবেলের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটানোর লক্ষ্যে নানারকম জগাখিচুড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব যেহেতু সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে - এবং যেহেতু তা সত্য হলে বাইবেলের জেনেসিস মিথ্যা হয়ে যায় - সেহেতু জন্ম দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন নামক আপাত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের। ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন আসলে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকে টিকিয়ে রাখার একটি প্রাণান্তকর চেষ্টা যাতে বলা হচ্ছে, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মেই এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে বিবর্তন সম্ভব নয়। বিবর্তন একটি জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া এবং এর পেছনে অবশ্যই রয়েছে ঈশ্বরের হাত। ঈশ্বরই বুদ্ধিবৃত্তিক নক্শা তৈরি করে দেন আর সে নকশা অনুসারেই সব ঘটে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যতই তোমরা প্রমাণ করো না কেন যে বিবর্তন স্বতস্ফূর্ত - আমরা কিন্তু মানছি না। এ সম্পর্কিত একটি চমৎকার লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে মুক্তমনায়। অভিজিৎ রায় ও বন্যা আহমেদ *ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনঃ আমেরিকায় সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন* প্রবন্ধে ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইনের মুখোশ উন্মোচন করেছেন সুনিপুন ভাবে। [দেখুনঃ www.mukto-mona.com/Articles/bonna/Part10_ID.pdf] খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৩ অক্টোবর সকাল ৯টায় ঈশ্বর নিজের হাতে পৃথিবী সৃষ্টি করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন জাতীয় কথার কোন বৈজ্ঞানিক সত্যতা পাওয়া যাচ্ছে না। বরং প্রকৃতিতে যে জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছে তাতে বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিই শক্ত হচ্ছে আরো।

এসব মাথায় রেখেই বাইবেলসেবীরা এগোচ্ছে সামনের দিকে। এর মধ্যেই গড়ে উঠেছে নানারকম ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স সেন্টার। ভ্যাটিকানের পোপরা রেখে ঢেকে হলেও স্বীকার করছেন যে মধ্যযুগে ধর্মের নামে বিজ্ঞানীদের ওপর অত্যাচার করা উচিত হয়নি। এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে যে কাজটি বাইবেলসেবীরা করতে শুরু করেছে তা হলো বাইবেলের নতুন নতুন ব্যাখ্যা। কিছুদিন পরে সত্যিই দেখা যাবে বাইবেলের নতুন সংস্করণ পুরনো সংস্করণের চেয়ে আলাদা। সেখানে নতুন জেনেসিস লেখা হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

৪

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কিছু সুবিধা আছে। যেহেতু তাদের ধর্মের কোন একক প্রবক্তা নেই - এবং যেহেতু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বেশির ভাগই সংস্কার নির্ভর - এবং যেহেতু তাদের দেবতার সংখ্যা অনির্ধারিত - সেহেতু তারা যে কোন সময়েই তাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা বদলে নিতে পারে। জ্যোতিষীরা যেমন ঘটনা ঘটে যাবার পরে প্রচার করতে শুরু করে যে ঘটনা ঘটার আগেই তারা তা ঘটবে জানতেন - সেরকম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জিত হবার পরে তা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কেউ কেউ তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থে খুঁজে পান। রাজীব গান্ধী নিহত হবার পরে অনেক জ্যোতিষী দাবী করেছিলেন যে তাঁরা তা আগেই জানতেন। পুরনো তারিখ দিয়ে নতুন সংবাদপত্র ছাপিয়ে প্রচার চালানো হয় জ্যোতিষীদের পক্ষে। ঠিক একইভাবে নতুন কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হবার সাথে সাথে তা ধর্মীয় গ্রন্থে খুঁজে পাবার কথা প্রচারিত হয়।

হিন্দুরা নবগ্রহ বলে যে নয়টি গ্রহের কথা মানেন - তা হলো সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, রাহু ও কেতু। রাহু ও কেতু কী জিনিস তা আমি জানিনা। হিন্দুধর্মের অনেক ধর্ম-বক্তার মতে রাহু আর কেতু হলো যথাক্রমে নেপচুন ও প্লুটো। সে না হয় বোঝা গেলো। কিন্তু সোম আর রবি গ্রহের কী হবে? চাঁদ আর সূর্য দুটোই গ্রহ? এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা নেই। ইউরেনাস আর পৃথিবী কেন তাদের নবগ্রহে ঠাঁই পায়নি তাও জানা যায় না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জ্যোতিষীরা আধুনিক উপায়েই প্রতারণা করেন। তাঁরা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তথ্য না জেনেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা বলেন, কস্‌মিক রে-র কথা বলেন, বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। তারা ইউরেনাস নেপচুন প্লুটোর নামও নেন, আর কম্পিউটারও ব্যবহার করেন। প্লুটো যে এখন আর গ্রহ নয় - তা জানার পরে দেখা যাবে তার পক্ষেও অনেক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ধর্মীয় গ্রন্থে।

৫

কোরান একদম অপরিবর্তনীয় - এরকম একটি অবস্থান নিয়ে কিছুটা বেকায়দায় আছে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা। সপ্তম শতাব্দীর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে লেখা কোরানের সব বাণী একবিংশ শতাব্দীতে এসেও একই রকম ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। তাই যখনই দেখা যাচ্ছে কোরানে যা লেখা আছে তা মিলছে না বাস্তবতার সাথে, তখনই তাকে বাস্তব সম্মত করার লক্ষ্যে নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, কোরানে যা লেখা আছে তাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। অথচ এই একই কথা বলার জন্য অনেককেই নিগৃহীত হতে হয়েছে অতীতে। দার্শনিক আল কিন্দি (৮০১-৮৭৩) বলতেন, *বিদ্বজ্জনদের কাজ হচ্ছে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা যা প্রকাশ করতে পারেননি তা নিজদের ভাষায় এবং সমসাময়িক প্রথামতো সম্পুর্ণ করা। কেতাবে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য যেসব কথা বলা হয়েছে তা যেখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে বড় ভুল হবে। জান্নাতের হুর ও অন্যান্য আকর্ষণীয় বস্তুকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কোরানে যখন বলা হয়, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পর্বতমালা, বৃক্ষ, পশুপাখি আল্লাহকে সিজদা করে তখন সিজদার অর্থ ধরতে হবে মান্য করা, সত্যি সত্যি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা নয়।* এসব কথা আজকাল যারা কোরানে বিজ্ঞান খুঁজে বেড়ান - তাঁরা খুবই বলেন। অথচ একথা বলার অপরাধে ষাট বছর বয়সী দার্শনিক আল্ কিন্দিকে সেদিন ৫০ দোররা মারা হয়, আর জনতা সোল্লাসে সেই শাস্তিদান উপভোগ করে [দেখুনঃ *একটি আন্তর্জাতিক বৎসর ও দুটি শতবার্ষিকী*, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬]।

৬

একথা সত্য যে সকল ধর্মগ্রন্থেই কিছু ভালো ভালো দার্শনিক কথাবার্তা আছে। কিন্তু সেগুলোকে টেনেটুনে একেবারে বিজ্ঞান বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করাটা আসলেই বোকামী। কারণ উপাসনা-ধর্ম বড়জোর কিছু ন্যায়নীতি - যা বিজ্ঞান নয় মোটেও। কারণ বৈজ্ঞানিক সত্য হলো বস্তুনিষ্ঠ যা সবার জন্যই সত্য। কিন্তু ধর্মীয় সত্য হলো সাম্প্রদায়িক। ইসলামে কিছু কিছু জিনিস হারাম - যা হিন্দুধর্মে হালাল। আবার হিন্দুদের কিছু কিছু হারাম জিনিস - মুসলমানদের জন্য হালাল। বিজ্ঞানে এরকম কোন ব্যাপার থাকতে পারে না। উপাসনা-ধর্মে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই সর্বশক্তিমানেরও সাধ্য নেই প্রাকৃতিক ধর্মকে অস্বীকার করার। বৈজ্ঞানিক সত্যের কাছে উপাসনা-ধর্ম যেভাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে - তাতে সন্দেহ নেই যে উপাসনা-ধর্ম বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাইবে। সে কারণেই উপাসনা-ধর্মের পৃষ্ঠপোষকেরা ধর্মের কেতাবে বিজ্ঞান খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কারণ তাঁরা জেনে গেছেন যে উপাসনা-ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান টিকে থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞান ছাড়া উপাসনা-ধর্মের টিকে থাকার কোন উপায় নেই।

২১ নভেম্বর ২০০৬
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া